The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 40, December 2025, ISSN 1813-0402

ইমতিয়ার শামীমের কিশোর উপন্যাস: সম্ভাবনার বাতায়ন

[Imtiar Shamim's Juvenile Novel: The Path of Possibilities]

Atika Mahmuda
M.Phil Researcher, Department of Bangla, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 40, December 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 25 May 2025
Received in revised: 02 April 2026
Accepted: 17 February 2026
Published: 15 April 2026

Keywords: Juvenile, ambidextrous, novel, visionary, self-esteem

ABSTRACT

Imtiar Shamim (B.1965) is a one of the most significant novelists of 80's. The novels written by this ambidextrous writer centered on teenagers are a good indicator of his sense of social reality. In the novels written for teenagers, he has exposed various corruptions, religious prejudices, dishonesty and hypocrisy of the state in the light of the perspective of teenagers. Not only discovering how to solve the problems and establish a beautiful Bangladesh, he looked at that through the youth. His juvenile characters are more time-conscious, age-conscious. They have the same knowledge about the reality of the society. They have a juvenile mentality while also being more realistic people with a sense of self-esteem. Imtiar Shamim is a visionary writer who sets teenage characters on the path of building the future in the light of contemporary times.

ভূমিকা

ইমতিয়ার শামীম (জ. ১৯৬৫) নিরলস সাধনা আর জীবনের বিচিত্র রসের গভীরতর বোধ জাত অভীপ্সা নিয়ে উপন্যাস জগতে আবির্ভূত হয়েছেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের জগতে তিনি একজন অতি পরিচিত মুখ। 'ইমতিয়ার শামীম আবেগময় গদ্যে, শ্লেষ ও চাবুকে আশি-উত্তর সমাজ রাজনীতির চিত্র চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেন। ইমতিয়ার শামীম প্রত্যন্ত গ্রামের এনজিও শোষণ, নারী নিগ্রহ, জাতীয় রাজনীতির অবক্ষয়ের হতদীর্ণ চেহারা তুলে ধরেন। সমাজকে ঘিরেই তাঁর আবেগ, চৌকস বর্ণনায় শিল্পকে সমাজ-অনুসৃত পাঠ করে তোলেন।'[১] মূলত আশি-নব্বয়ের দশক তাঁর উপন্যাসের বিচরণভূমি। কথাসাহিত্যে তিনি বিশেষ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। কথাসাহিত্যে অবদানের জন্য তাকে ২০২০ সালে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সমাজ মানুষের বহুবিচিত্র বিষয় তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। স্থান পেয়েছে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষও। বলাবাহুল্য মানুষই সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু। এই মানুষকে কেন্দ্রে রেখে ইমতিয়ার শামীমের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ থেকেছে শিশু-কিশোরদের দিকেও।

কিশোর-কিশোরীদের মন ও মনন থাকে স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছতা নিয়েই তারা নতুন কিছু করার উদ্দীপনা পায়। পরবর্তীতে যখন তারা তরুণে পরিণত হয় তখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নবকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এই নতুন প্রাণে উদ্দীপ্ত কিশোরদের নিয়েই ইমতিয়ার শামীম লিখেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস। কারণ প্রতিভাবান আধুনিক সাহিত্যিকরাই কিশোর পাঠকদের জন্য মননশীল সাহিত্য তৈরি করতে পারেন। কিশোরদের নতুন চিন্তাভাবনা উদ্দীপনাতেই আমাদের দেশ, বিশ্ব, রাজনীতি ও সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। কিশোরদের সরলতা, কোমলতা, স্বচ্ছতা, নতুনভাবে দেখার ও চিন্তাভাবনার মধ্যে লেখক তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি স্বার্থান্বেষী মানুষের চেয়ে কিশোরদের সরলতা ও স্বচ্ছতার উপর ভরসা করেছেন বেশি।

ইমতিয়ার শামীম পেশায় একজন সাংবাদিক হলেও লেখালেখির শুরুতেই তিনি, 'কিশোর বাংলা' পত্রিকাতে (ঢাকা থেকে প্রকাশ) কিশোরদের জন্য গল্প প্রবন্ধ লিখতেন। বড়দের নিয়েই তিনি বেশিরভাগ গ্রন্থ লিখেছেন তবুও ছোটদের জন্যও পাওয়া যায় কিছু গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস। কিশোরদের নিয়ে ইমতিয়ার শামীম ৩টি উপন্যাস লিখেছেন। কিশোরদের মানবিকতাবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি উপন্যাসগুলো লিখেছেন। কিশোররা যে জগতে বিচরণ করে তার মধ্যে গিয়ে তিনি যেন নিজের অভিজ্ঞতাগুলো বলে যেতে চান কিশোরদের। কৌতুকমিশ্রিত-কৌতুহলজাগরিত ভাষায় লেখা এই উপন্যাসগুলো। উপন্যাসগুলোর নামও দিয়েছেন তিনি কবিতার মতো কল্পনা দিয়ে রাঙ্গিয়ে। যথা- *পাতার বাঁশি বাজে* (২০১৫), *নদী ডাকাতের খুটখাট জলদৈত্যের এক ঘা* (২০১৭) এবং *সুখে দুখে বৃষ্টিনদী* (২০২০)। এই উপন্যাসগুলোতে সমাজবাস্তবতার নিরিখে কিশোরদের মধ্যে তিনি অপার সম্ভাবনার আলো প্রত্যক্ষ করেছেন।

আমরা জানি কিশোর তরুণেরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারা চাইলেই দেশের যেকোনো সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। যেমনটা আমরা আমাদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ৫২'র ভাষা আন্দোলনে, ৬৯' এর গণঅভ্যুত্থানে, ৭১' এর স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ২৪'এর জুলাই আন্দোলনে দেখেছি। কিশোর তরুণদের মধ্যে যে সাহসিকতা থাকে যে উন্মাদনা থাকে তা অন্য বয়সীদের মধ্যে দেখা যায় না। কিশোর তরুণেরা সদা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। এজন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিশোর তরুণ সম্পর্কে বলেছেন,

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।[২]

এই তিনটি উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতেই আছে কিশোর-তরুণেরা। তাদের জীবনীতেই উপন্যাসের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। কিশোরদের মননচেতনা, আত্মবিশ্লেষণ, মন ও মানস তাদের মতো করেই বর্ণনা করেছেন লেখক। প্রতিটি উপন্যাসেই যে মিলটি পাওয়া যায় তা হলো এই কিশোর-তরুণেরা একটি সম্ভাবনাময় দিনের স্বপ্ন দেখে। তাঁরা শুধু স্বপ্নই দেখেনা স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কাজও করে। আগামী প্রজন্মকে তাঁরা উপহার দিতে চায় পৃথিবীর বুকে একটি সুন্দর বাংলাদেশকে। যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের সকল মানুষ একই ছায়াতলে দেশমাতার কল্যাণে কাজ করবে এবং সবাই মিলেমিশে থাকবে।

সমাজের অধিকাংশ মানুষ যেখানে ক্ষমতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ব্যক্তিস্বার্থ যেখানে সর্বস্ব সেখানে কিশোর শ্রেণির নতুন চিন্তা কর্মোদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেমই যেন মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র সহায়। তারাই পারে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করতে। উপন্যাসগুলোতে লেখক সেই সম্ভাবনা ও দায়িত্বের কথাই বলেছেন কিশোরদের কেন্দ্র করে।

১. পাতার বাঁশি বাজে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস *পাতার বাঁশি বাজে*। এই উপন্যাসে ইমতিয়ার শামীম এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে ও তার চেতনা অন্তরে ধারণ করতে কিশোরদের আহ্বান জানিয়েছেন। মায়াময় ভাষার মাধ্যমে লেখক ছোট্ট ছেলে 'অংশু'র চোখ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনিয়েছেন। অংশু যার বয়স দশ-বারো, তার দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ছোটদের জন্য লিখতে গিয়েও তিনি ভুলতে দেননি যে কত কষ্টের বিনিময়ে কত ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

ব্যোমকেট ডাক্তার তার ছোটবেলার গল্প শোনায় কয়েকজন ছোট্ট ছেলেমেয়েকে। এই গল্প, মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের যেই সময়ে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতেও পাক বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। আর পাক বাহিনীর সাহায্যকারী হিসেবে সবুর আলীর মতো রাজাকারেরাও নিজেদের প্রস্তুত করে ফেলেছে। তাদের হাতে নিরব নিষ্ঠুর বলি হতে হয় অংশু ও তার মাকে। গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত 'বিজনবাবুর ভিটা'। এই ভিটারও রয়েছে এক ইতিহাস। বিজনবাবুর ছেলে স্বজনবাবুকে কারা নাকি খুন করেছিল। তারপর বাড়িঘর ফেলে বিজনবাবুরা সবাই ভারত চলে যায়। বিজনবাবুর জায়গাজমি সবকিছু দখল করে সবুর আলীর বাপ-চাচারা। আর শূন্য ভিটা পড়ে থাকে ।

নিজাম মোল্লা আর সবুর আলীরা এলাকার হর্তাকর্তা হয়ে বসে। যতবেশি হিন্দুকে মুসলমান বানানো যাবে তত বেশি নেকি পেয়ে বেহেশতের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে এই ভ্রান্ত ও স্বার্থান্বেষী চিন্তায় তারা হিন্দু মেয়েদের জোর করে মুসলমান বানিয়ে বিয়ের পরিকল্পনা করে। ছোট্ট অংশু এইসব ব্যাপার বুঝতে না পেরে তার মাকে প্রশ্ন করে হিন্দুদের জোর করে মুসলমান বানিয়ে ওরা সত্যিই স্বর্গে যেতে পারবে কি না? অংশুর প্রশ্নের উত্তরে তার মা চমৎকার কথা বলে,

> ওরা ঠিক বলে নাই। শোন, ওই সব কথা যদি ঠিকই হতো, তা হলে অনেক আগেই এখানকার মুসলমানরা হিন্দুদের ধরে বেঁধে জোর করে মুসলমান বানিয়ে ফেলত । পাকিস্তানিদের জন্য অপেক্ষা করত না।..... মানুষ তার ধর্ম পায় জন্মসূত্রে– বাপ-দাদার ধর্মই সে পালন করে। কেউ যদি বুঝে শুনে নিজের ইচ্ছায় ধর্ম পালটায়, সেটা এক ব্যাপার; কিন্তু জোর করে কারও ধর্ম বদলে দেয়া খুবই খারাপ।[৩]

যুদ্ধের ভয় শুধু হিন্দুদের মধ্যেই নয় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও থই থই করতে থাকে। এরকম ভয়ের মধ্যেই বাজারে জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়াতে থাকে মজুদদারেরা। দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। ক্ষুধার তাড়নায় অংশু ও তার মা সন্ধ্যা বিজনবাবুর ভিটাতে পাকা গাবের সন্ধানে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে থাকে । ঠিক সেই মুহূর্তেই তাদের মনে হয় পুরো পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল ।

> অংশু পা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ শুকনো করে পেছন ফিরে তাকায়। দেখতে পায়, মাও দাঁড়িয়ে গেছে। তখনও গুলি চলছে। এতদিন লোকজনের মুখে গোলাগুলির কথা শুনেছে তারা। কিন্তু আজই প্রথম নিজেদের কানে শুনছে, কেমন সেই গুলির আওয়াজ। মনে হচ্ছে, বাতাসের চেয়েও তীব্র বেগে কোনদিকে যেন সেসব ছুটে চলেছে।[৪]

গুলির শব্দে সবাই ভয়ে আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসে পালানোর জন্য। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের হাতে থাকে তাদের শেষ সম্বল বোচকা, পোটলাপুটলি অথবা হাতে করে টানার মতো ছোট টিনের বাক্স। সবাই প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিরাপদ আশ্রয় ইন্ডিয়ার দিকে চলতে থাকে। অংশু আর তার মাও এই শরণার্থীদের সঙ্গে যোগ দেয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নৌকাতে ওঠার সময়ে অংশু মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নৌকা তার মাকে নিয়ে চলে যায় আর সে তীরে পড়ে থাকে। সে ভাবে তার মা তাকে নিতে ঠিকই বাড়ী ফিরে আসবে। তাই সে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাড়ি ফিরতি পথে যোগেন কাকার সঙ্গে দেখা হলে জানতে পারে তার খেলার সাথী আরতিও হারিয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রিয় মানুষগুলোর এমন করে হারিয়ে যাওয়ার চিত্র বাংলাদেশের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ইমতিয়ার শামীম ছোট্ট অংশুর মাধ্যমে অত্যন্ত সাবলীলভাবে এই বাস্তবতাকে তুলে এনেছেন। তাঁর বর্ণনা স্বাভাবিক হলেও পাঠকের চিত্তকে তা গভীরভাবে নাড়া দিয়ে যায়। পাঠকের সামনে মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের চিত্র ছবির মতো ভাসতে থাকে, যেন মনে হয় তারা সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

পাতার বাঁশি বাজে উপন্যাসের কথক ছেলেটিই হলো ব্যোমকেট ডাক্তার। যে এখন একদল কিশোর-কিশোরীকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছে। যার প্রাণ বাঁচিয়েছিল অংশু নামের ছেলেটি। কিন্তু ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদদের কাতারে নাম লেখাতে হয়েছিল অংশু ও তার মাকে । অংশু ও তার মা আমাদের মনে করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধে তাদের আত্মনিবেদনের কথা। অবশেষে আমরা বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছি অনেক প্রাণের বিনিময়ে। কিন্তু এইসব সাধারণ মানুষের মৃত্যুর পেছনে যারা দায়ী ছিল তাদের শাস্তি কী আমরা দিতে পেরেছি? শেষে ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন আশার কথা। নিশ্চয়ই তাদের শাস্তি হবে আর তাদের শাস্তি দেবে ভবিষ্যত প্রজন্ম। আর দূরে নদীর বুকে অনেকদিন পর আমরা লাল-সবুজ পাল তোলা নৌকা দেখি। মনে হয়,

> বাংলাদেশটা ভেসে-ভেসে এগিয়ে আসছে আমাদের সবার দিকে। আমরা বলাবলি করি, সামনের ছুটিতেই আমরা দল বেঁধে বিজনবাবুর ভিটায় যাব। পাকিস্তানিদের তো এখন আর পাওয়া যাবে না। তবে সবুর আলীদের আমরা খুঁজে বের করব। এইভাবে অংশুকে মেরে ফেলার জন্যে, অংশুর মাকে মারার জন্য শাস্তি দেব। এ কাজ করতেই হবে আমাদের। না হলে কোন মুখ নিয়ে আমরা দেখতে যাব বিজনবাবুর ভিটা? বিজনবাবুর ভিটা কোথায় জানা নেই আমাদের। তবু টের পাই আমরা, একটা পাতার বাঁশি বেজে উঠছে বাতাসের ছোয়া লেগে।[৫]

সেই পাতার বাঁশি যা অংশু তার কবরের উপর রেখে দিতে বলেছিল। সেই বাঁশির সুর যা শুনে দূর থেকে আগামী প্রজন্ম ছুটে আসবে মুক্তিযুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। দেশ মায়ের বুক থেকে সবুর আলীদের মতো বিষাক্ত কাঁটাকে উপড়ে ফেলে নিষ্কণ্টক স্বাধীন দেশ উপহার দিতে।

ইমতিয়ার শামীম এই উপন্যাসের মাধ্যমে মুক্তির আলো আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আহ্বান ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন শিশু কিশোরদের মাঝে। পাতার বাঁশি বাজে উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি কিশোরদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কে ধারণ করাতে চেয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে। তাদের জানাতে চেয়েছেন কেন যুদ্ধ করতে হয়। কেন মিছিল করতে হয়। উপন্যাসের পরিসরের ভেতরেই ঔপন্যাসিক ইমতিয়ার শামীম এমন বাঁশির সুর তুলেছেন যে সুর কিশোরদের উদ্দীপ্ত করে নতুন দায়িত্ববোধে যার প্রশংসা না করে উপায় থাকে না। এ বাঁশির সুরে যে দায়িত্বের ও আশাবাদের কথা তিনি বলেছেন তা প্রতিটি মানুষের অন্তরে বাজতে থাকে অনুপ্রেরণা হয়ে।

২. নদীডাকাতের খুটখাট জলদৈত্যের এক ঘা

নদীডাকাতের খুটখাট জলদৈত্যের এক ঘা উপন্যাসের কাহিনী হুরা নদীকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলেছে। কাজলতলী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এই নদী। গ্রামের লোকেরা হুরা নদীকে হুরা সাগর বলে। হিমালয় থেকে বয়ে আসা যমুনা নদীর শাখা নদী এই হুরা সাগর। গ্রীষ্মের সময় এই নদীতে কোন পানি না থাকলেও বর্ষায় কলকল করে পানি আসার গর্জন শুনে মনে হয় সমুদ্র প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে উঠছে। গ্রীষ্মের এই মরা নদীকে তাই কেও নদী বলে না। বলে সাগর। গ্রীষ্মের সময় জেগে ওঠা সরস পলিমাটির ভূমিতে চোখ পড়ে ভূমি দস্যুদের। তারা দখল করে নিতে চায় নদীর বুক। নদীতে বাঁধ দিয়ে মাটি ফেলে বানাতে চায় শস্যক্ষেত। কিন্তু গ্রামের কিছু কিশোর-তরুণ এই ভূমি দস্যুদের প্রতিহত করে নদী রক্ষায় এগিয়ে আসে। তাঁরা জানে শক্তিতে পেরে উঠবে না এই দস্যুদের সঙ্গে। তাই পরিকল্পনামাফিক বুদ্ধি প্রয়োগ করে তারা হুরা সাগরকে রক্ষা করে।

নদী ডাকাতের খুটখাট জলদৈত্যের এক ঘা উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামের মেম্বার আব্বাসকে, যে আগে যমুনা নদীর জলদস্যু ছিল এখন সে হুরা নদীকে দখল করে ভূমিদস্যু হয়েছে। নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে সেখানে মাটি ফেলে উঁচু করে নিজের জমি বানাতে চায়। থানার দারোগাকে টাকা দিয়ে এবং চেয়ারম্যানের গমের বরাদ্দে ভাগ না বসিয়ে জমি দখলের পথ পরিষ্কার করে নেয়।

> বর্ষার সময় অনেক রাস্তাঘাটই ভেঙ্গেচুরে যায়, মাটি ধ্বসে পড়ে বানের পানির ভেতর। বর্ষা চলে গেলে শুরু হয় রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ। সেজন্যে গম বরাদ্দ হয়, দিনমজুরদের হাতে তখন কোনো কাজ থাকে না। কম পয়সা দিয়েই তাদের কাজ করানো যায়। আব্বাস মেম্বার বুঝেছিলেন গম বিক্রি করে ইলেকশনে যত টাকা খরচ হয়েছে তার দিগুণ টাকাপয়সা উঠানোর ধান্ধায় রয়েছেন চেয়ারম্যান।[৬]

আব্বাস মেম্বারের নদী ডাকাতি অর্থাৎ নদী দখলের ঘটনাটি গ্রামের একদল কিশোর যখন গল্প আড্ডায় মশগুল থাকে তখন তাদেরই এক বন্ধু কামালের মাধ্যমে তারা শুনতে পায়,

> ওদিকে গিয়ে দেখে আয়, আব্বাস মেম্বার হুরা সাগর ডাকাতি করছে। শুনে থতমত খাই আমরা। পুকুর চুরি বলে একটা বাগধারা আছে। সাগর ডাকাতি কিংবা নদী ডাকাতি সেই ধরনের কোনো বাগধারা কিনা চিন্তা করতে থাকি।[৭]

'পুকুর চুরি' বাগধারা দিয়ে যেখানে বড় ধরনের চুরি বোঝানো হয় সেখানে 'নদী ডাকাতি' কথাটি আরো ব্যাপক অর্থ বহন করে। কারণ চুরির থেকেও ডাকাতি বেশি ভয়ংকর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। ঔপন্যাসিক ইমতিয়ার শামীম 'নদী ডাকাতি' ব্যঙ্গাত্মক শব্দটি ব্যবহার করেছেন পুকুর চুরি থেকেও বড় ধরনের অপরাধের রূপকে। এই উপন্যাসের কথক 'আমি' অর্থাৎ উত্তম পুরুষ। উপন্যাসের কথকও একজন কিশোর।

কথকের একদল কিশোর বন্ধু আছে-কামাল, কাশেম, কবির, হালিম, বাদল। আর দু'জন তরুণ ব্যোমকেট ডাক্তার এবং নুরু ভাই যারা অনেকটা বন্ধুর মতোই এই কিশোরদের। সবাই মিলে নদী ডাকাতিদের হাত থেকে হুরা নদীকে রক্ষা করতে চায়। ভূমিদস্যু আব্বাস মেম্বারের প্রভাবের সঙ্গে পেরে উঠবে না জেনে তারা 'হুরা সাগরের জলদৈত্য' সেজে ভয় দেখায়।

> অনেকরাতে মরা মানুষের খুলি জোগাড় করতে রওনা হলাম আমরা সবাই। ব্যোমকোট ডাক্তারও আমাদের সঙ্গী হলেন। ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রামচরণপুর শ্মশানের পাশে সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাব আমরা। ফিরে এসে সেই খুলি আব্বাস মেম্বারের বাড়িতে ঝুলিয়ে দিতে হবে সকাল হওয়ার আগেই।[৮]

জলদৈত্যর নামে কখনো উড়ো চিঠি পাঠিয়ে, জলদৈত্যর অদৃশ্য শুড়ের মাধ্যমে রক্তচুষে খাওয়ার কথা বলে, রাতের অন্ধকারে পুকুরপাড়েও লিচু গাছের ভূতের ভয় দেখিয়ে, এমনকি ঘরের মধ্যে মরা মানুষের খুলি দিয়ে ভয় দেখিয়ে একসময় আব্বাস মেম্বারকে তারা সত্যি বিশ্বাস করিয়ে ফেলে হুরা নদীর জলদৈত্য আব্বাস মেম্বারের উপর অনেক রেগে আছে। কারণ আব্বাস মেম্বার হুরা নদীকে দখল করে শস্যক্ষেত্র বানাতে চায়। অবশেষে আব্বাস মেম্বার হুরা সাগরের জলদৈত্যর ভয়ে নদী দখল করা বন্ধ করে। কিশোরেরা তাদের সাহসী পদক্ষেপের মাধমে হুরা নদীকে ভূমিদস্যু মুক্ত করতে সক্ষম হয়। তাঁদের সচেতনতা, সাহসিকতা, নতুন চিন্তাশক্তি ভূমিদস্যুদের করাল গ্রাসের শিকার হতে হুরা নদীকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। তাদের নিঃস্বার্থ চিন্তা দেশ-মানুষের রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে।

৩. সুখেদুখে বৃষ্টিনদী

সুখেদুখে বৃষ্টিনদী ইমতিয়ার শামীমের একটি উল্লেখযোগ্য কিশোর উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি কিশোরদের দৃষ্টি দিয়ে সমকালীন প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষমতার দৌরাত্ম্য সবকিছুর সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। বৃষ্টিনদী একটি গ্রাম। এই গ্রামেই বাস কিশোর অরিত্রের। সে নবম শ্রেণির ছাত্র। উপন্যাসের শুরুর ও শেষের দিকের ঘটনাবলী কিশোর অরিত্রের আত্মকথনে বর্ণিত। অন্যান্য গ্রামের মতোই এ গ্রামের মানুষেরাও সুখে দুখে মিলেমিশে বসবাস করে। কিন্তু এক ভাদ্রের বৃষ্টিঝরা দিনে এই গ্রামের সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়। ভোটে জিতে যাওয়া দলের লোকেরা হামলা করে বৃষ্টিনদী গ্রামে। কারণ এই গ্রামের লোকেরা কারো নির্দেশে নয়, তাদের পছন্দমত প্রার্থীদের ভোট দিতে চেয়েছিল।

> কয়েকদিন আগে ভোটকেন্দ্রে এই লোকগুলোকেই দেখেছিল অরিত্র। লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল জোর করে। বাবাকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল ওরা।[৯]

যুগ যুগ ধরে এই দেশে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। ক্ষমতাশীল লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর। লেখক ইমতিয়ার শামীম *সুখেদুখে বৃষ্টিনদী* উপন্যাসের কিশোর চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষমতার দাপটে করে চলা তাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে অত্যন্ত সচেতনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত এই কিশোররা বুদ্ধিমত্তা ও সাহস কে কাজে লাগিয়ে বৃষ্টিনদী গ্রাম ও বোধিবৃক্ষ বিদ্যালয়কে কীভাবে রক্ষা করেছিল তার আখ্যান রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে।

অরিত্রের বোন তৃণা। সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। দুজনই বোধিবৃক্ষ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। অরিত্রের বাবা রাশিদুর রহমান, মা শামসুন্নাহার শহরে চাকরী করেন। তাই সকালের ট্রেন ধরেই তারা শহরে চলে যান। গ্রামে মোট ৩৬ ঘর মানুষের বসবাস। গ্রামের কর্মক্ষম অন্যান্য পেশাজীবী মানুষেরাও সকলেই তাদের কর্মক্ষেত্রে চলে যান। ফলে সারাদিন গ্রাম ফাঁকাই থাকে বলা যায়। এমন সময়কেই হামলা করার উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করে দুষ্কৃতিকারীরা। অরিত্র সেদিন স্কুলে না গিয়ে প্রতিবেশি বন্ধু শ্যামলের সঙ্গে মার্বেল খেলছিল। সেই সময় তারা দেখতে পাই পুরো গ্রাম যেন দাবানলের মতো জ্বলছে। সেসব দেখে দুষ্কৃতিকারীরা বীভৎস হাসি দেয়। শ্যামলের বোন ছুটকিদিকে টেনে হিচড়ে ঝোপের ভেতরে নিয়ে যেয়ে তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করে। শুধু বড়রা না ছোটরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়না। এভাবে গ্যাং রেপের শিকার হয় কয়েকজন। মার্ডার হয় চারজন। অরিত্র ও শ্যামল দৌড়ে স্টেশনে চলে আসে। আর দেখে,

> আকাশে ঘন কালো কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোয়ো উঠছে। পরক্ষণেই তা গণগণে লালচে মেঘ হয়ে উঠছে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রিয় গ্রাম বৃষ্টিনদী গ্রাম।[১০]

ট্রেন ধরে তারা শহরে স্টেশনের পাশেই থাকা চাচা আজিজুর রহমানের বুকস্টলে আসে এবং বাবা-মার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

বৃষ্টিনদী গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা রৌদ্রছায়া গ্রামের বোধিবৃক্ষ বিদ্যালয়ের পথে ধাবিত হয়। কেননা বৃষ্টিনদী গ্রামের যেসব শিক্ষার্থী আছে স্কুলে তাদেরকেও ছাড়বে না তারা। দুষ্কৃতিকারীরা স্কুলে হামলা করতে আসছে তা জানতে পেরে বোধিবৃক্ষ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিছিল মাহমুদ অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের মাঠে একত্রিত করেন। প্রত্যেক শ্রেণির ক্যাপ্টেনদেরকে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্যালয় ও বৃষ্টিনদী গ্রামের শিক্ষার্থীদের রক্ষার্থে কী করতে হবে তার দিকনির্দেশনা দেন এবং প্রয়োজনে নিজেদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। মিছিল মাহমুদ একজন আদর্শবান শিক্ষক। তিনি এই বিদ্যালয়ে আসার পর থেকে শুধু পড়াশোনায় এগিয়ে নেওয়াই নয়; শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ও সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিতও তৈরি করেছেন। এ প্রসঙ্গে বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপে উল্লেখ আছে,

> এটি সেরকমই এক গল্প-যেখানে চারপাশের নানা অন্যায়-অপরাধের মধ্যেও কিশোর-কিশোরীরা চাইছে ভালো থাকতে। চাইছে অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে। এটি তাদেরই গল্প-যারা জ্বালিয়ে রেখেছে সেই উজ্জ্বল আদর্শের আলো, যা একদিন জ্বালিয়েছিলেন প্রতিবাদী শিক্ষক শহিদ ড. শামসুজ্জোহা। যার উত্তরাধিকার মিছিল মাহমুদ।[১১]

ঔপন্যাসিক ইমতিয়ার শামীম মিছিল মাহমুদের মাধ্যমে ড. শামসুজ্জোহার আদর্শকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। যে আদর্শ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে স্পর্ধা দেখায়। সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে শেখায়। অন্যায়কে প্রতিহত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার মন্ত্রণা যোগায়।

শিক্ষার্থীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই দলে বিভক্ত হয়। দুলাল, মাইনুল, হেলাল আর শাহেদ পুলিশ আনতে জিয়নকাঠি থানায় যায়। অশেষ, তৃণা, শুভ, শাহনাজ সহ সবাই মস্তানদের কুপোকাত করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। অশেষ যদিও নতুন এমপির গ্রামের তথাপি সেও মনে করে সবার আগে সে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। যেকোনো ভাবেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে হবে। কোরবান-সবুরের দলবলকে সে কৌশলে বিদ্যালয়ে এনে পরিত্যক্ত একটা কক্ষে আটকে ফেলে। সবাই মিলে তাদের এমন বেহাল দশা করে যে, 'কোরবানের মনে হয় পুরো স্কুলটাই কি বৃষ্টিনদী গাঁ হয়ে গেল নাকি?'[১২]

অপরদিকে দুলালরা এক ঘন্টার উপর থানায় দাঁড়িয়ে থাকলেও পুলিশরা পাত্তা দেয়না। কারণ পুলিশরাও গা বাঁচিয়ে চলতে চায়। তারা জানে নতুন এমপির লোকজনের কাজ এগুলো। কিছু করতে গেলে তার রোষানলে পড়তে হবে। এরমধ্যে অরিত্রের বাবা ও চাচা থানায় এসে পড়লে দুলালরা তাদের দেখে যেন প্রাণ ফিরে পায়। পুলিশ অরিত্রের বাবা রাশিদুর রহমানকে ও চাচা আজিজুর রহমানকে দেখেও গুরুত্ব দেয়না। তাদের নিজেদের থানায় যাওয়ার কথা বলে পুলিশের কর্মকর্তা ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়। চেয়ার ছেড়ে তারা রওনা দেবে এমন সময় এএসপি খালেক (অরিত্রের বাবার এক চাচাতো ভাইয়ের ছেলে) আসেন। তাকে দেখে সব পুলিশ উঠে দাঁড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এটাই আমাদের দেশের প্রকৃত চিত্র। ক্ষমতা যার থাকে সবাই তাকে সম্মান করে, না হলে কেও গুরুত্ব দেয়না। এখানে যদি এএসপি খালেক না থাকতেন তাহলে দুলাল ও রাশিদুর রহমানদের হয়তো থানা থেকে কোনো সাহায্য মিলত না। এএসপি খালেকের তত্ত্বাবধানে বৃষ্টিনদী গ্রামে পুলিশ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

> ওয়্যারলেসে কথা বললে কী হবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশ অফিসার। যেন পারলে এখনই একটা সালাম ঠুকে দেবেন। ভারি মজা লাগে অরিত্রের। এজন্যই বলে ঠেলায় পড়লে বাঘে ধান খায়। এখন ঠিকই ব্যবস্থা নিচ্ছে।[১৩]

হইচই করে এমপি মকবুল মিয়া ও তার লোকজন থানায় এসে অভিযোগ জানায় তার লোকজনকে ছাত্ররা হাড়গোড় ভেঙ্গে স্কুলের মধ্যে আটকে রেখেছে। সম্মিলিত জনতার সামনে প্রতিকূল অবস্থা দেখে মকবুল মিয়া তার ভোল পাল্টালে পুলিশ আযম মোল্লা ও কোরবান আলীর দলকে গ্রেপ্তার করে। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই তারা ফিরে আসবে।

কেটে যায় কিছুদিন। বৃষ্টিনদী গ্রামের সবাই তাদের ঘরবাড়ি মেরামত করার কাজে ব্যস্ত। বোধিবৃক্ষ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং বোর্ডের প্রধান এমপি। তাই অন্যান্য সদস্যরাও তার মতে প্রভাবিত। ফলে বৃষ্টিনদী গ্রামের মেরামতের কাজে তারা কোনো সহায়তা করতে আসে না। অশেষের পরিবারের ওপরও চাপ আসে ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কে অন্যরকম কথা বলার জন্য। বৃষ্টিনদী গ্রামে নবীনদারা সহ আরও কয়েকজন চলে যায় গ্রাম থেকে। নতুন বছর আসে। হেড স্যার মিছিল মাহমুদকে সাসপেন্ড করা হয়। থানা থেকে পুলিশ এসে জিনিসপত্র বের করে দেয়। মুহূর্তেই এই ঘটনা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌছে যায়। তারা দলবেধে স্কুল ড্রেস পরে হাজির হয় স্কুল গেইটে। সমস্বয়ে চিৎকার করে সব শিক্ষার্থী বলে ওঠে-'যেতে দেব না, যেতে দেব না।' ওসি জালালউদ্দিন ঘটনা সামলাতে হিমশিম খান। এই পরিস্থিতিতে হেডমাস্টার মিছিল মাহমুদ

নিজেই ঘটনার সামাল দিতে এগিয়ে আসেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে বিদায় নেন। শিক্ষার্থীরা সবকিছু বুঝতে পারে কিন্তু তাদের কিছুই করার থাকে না।

> ওরা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে নবীন দাদা চলে গেছেন। এবার স্যারকে যেতে হলো সকাল সকাল। নীরব ব্যথায় পুড়তে পুড়তে মনে মনে ভাবে ওরা, আর না-আর কাউকেই এভাবে চলে যেতে দেবে না তারা। তবে সেজন্য একটু প্রস্তুতি দরকার, এবার সেই প্রস্তুতিই নেবে তারা।[১৪]

মিছিল মাহমুদের মতো মহৎ ব্যক্তিদের এভাবেই বিতাড়িত হতে হয়। ক্ষমতালিপ্সু লোভী ব্যক্তিদের ক্ষমতায় টিকে থাকার কূটচক্রান্তে বারবার পরাজিত হতে হয় মিছিল মাহমুদদের। কিন্ত তাদের দেওয়া আদর্শ থেকে যায়। সেই আদর্শে বলীয়ান হয়ে কিশোররা স্বপ্ন দেখে একদিন সততা আদর্শের জয় হবেই। এভাবেই আগামী দিনের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রেখেছেন লেখক *সুখেদুখে বৃষ্টিনদী* উপন্যাস এর কিশোর কিশোরীদের মধ্য দিয়ে। বৃষ্টিনদী গ্রাম যেন একখণ্ড বাংলাদেশ আর এ গ্রামের কিশোর কিশোরীরা হলো সে দেশে সম্ভাবনাময় প্রজন্ম।

উপসংহার

কিশোরদের মনে ভালবাসা, আদর, স্নেহ পাবার ইচ্ছেটা প্রবল থাকে। *পাতার বাঁশি বাজে* উপন্যাসে অংশুর মধ্যে মায়ের প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ দেখতে পাই। আবার *সুখেদুখে বৃষ্টিনদী* উপন্যাসে প্রধান শিক্ষক মিছিল মাহমুদের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও সম্মানের প্রবল বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। স্বভাবজাতই কিশোররা চঞ্চল প্রকৃতির ও কৌতুহলপ্রবণ। *নদী ডাকাতের খুটখাট জলদৈত্যের এক ঘা, পাতার বাঁশি বাজে, সুখেদুখে বৃষ্টিনদী* তিনটি উপন্যাসের প্রত্যেকটি কিশোর চরিত্রেই এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা আমাদের শরীর, মন ও চেতনার জগৎকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। জীবনে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা কিশোর-কিশোরীদের চেতনার জগৎকে পরিপক্বতা দান করে। ঔপন্যাসিক তাঁর কিশোর উপন্যাসে কিশোরদের মানসিক বিকাশকে তরান্বিত করেছেন এবং সমাজে ঘটে যাওয়া অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাকে তুলে এনেছেন। সমাজের ভেতরের ভণ্ড স্বার্থান্বেষী শ্রেণির মুখোশ উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পট পরিবর্তনকে সুদক্ষ হাতে উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কিশোরদের পূর্নাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিশোর চরিত্রগুলোকে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি করেছেন। যেকোনো অন্ধকার সময়, ফ্যাসীবাদী ও দ্বন্দ্বময় সময়ে কিশোররা এগিয়ে এসেছে আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দেশের কল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের আত্মোৎস্বর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিশোরদের এই স্বচ্ছ চিন্তাধারা যদি তারুণ্যে স্থানান্তরিত হয় তবে আমাদের দেশ, আমাদের ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হতে বাধ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখক এই উপন্যাসগুলো লিখেছেন কিশোরদের নিয়ে। কিশোরদের নিয়ে তিনি যেমন আশাবাদী তেমন তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ইমতিয়ার শামীম উপন্যাসের প্রত্যেকটি কিশোরকেই অধিক যত্ন সহকারে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট কিশোর চরিত্রগুলো সময় সচেতন, যুগ-সচেতন। তারা সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে। তাদের মধ্যে রয়েছে কিশোরসুলভ মনোবৃত্তি একই সাথে তারা আবার বাস্তববাদী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। তাদের চরিত্রে বিবেকবোধ প্রবলভাবে জাগ্রত। লেখক একদিকে সমাজের রঙিন চশমা-খোলা রূপ যেমন দেখান, অন্যদিকে নতুন আলো দেখাতেও ভোলেননি, সেই আলো তারুণ্যের আলো।

তথ্যনির্দেশ

১ শহীদ ইকবাল, বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬), পৃ. ২২৯।
২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সবুজের অভিযান, রবীন্দ্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০১২), পৃ. ২৩৯।
৩ ইমতিয়ার শামীম, পাতার বাঁশি বাজে, (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫), পৃ. ৪২।
৪ তদেব, পৃ. ৪৫
৫ তদেব, পৃ. ৯৬)
৬ ইমতিয়ার শামীম, নদী ডাকাতের খুটখাট জলদৈত্যের এক ঘা, (ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ফেব্রুয়ারি ২০১৭), পৃ. ৪১।
৭ তদেব, পৃ. ১৬।
৮ তদেব, পৃ. ০৭।
৯ ইমতিয়ার শামীম, সুখেদুখে বৃষ্টিনদী, (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০), পৃ. ১১।
১০ তদেব, পৃ. ১৫।
১১ তদেব, পৃ. বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপ ।
১২ তদেব, পৃ. ৭৪।
১৩ তদেব, পৃ. ৯৯।
১৪ তদেব পৃ. ১৪৪।